ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 08. No. 01. February 2013

পরিবারে মেয়ে-শিশু: বৈষম্যের ধরন ও প্রভাব

শামীম আহম্মেদ*
মো. তানভিরুল হক**

Abstract: Today's children will be the future helmsmen of a country. The term *child* is used to refer both male and female. The different expectation towards male and female children leads to their rearing up process differently. From childhood a discriminative behaviour is observed in all aspects of their life including feeding, dressing-up, as well as education. In this article the causes and effects of such kind of discrimination towards female children are identified.

শিশুরা সকল জাতিরই ভবিষ্যৎ। তাই তাদেরকে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। শিশুর প্রথম পরিবেশ হচ্ছে তার পরিবার। পারিবারিক সম্পর্ক ও দস্তুর শিশুর পরবর্তী জীবনের ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশু বড় হওয়ার পর যদিও বিদ্যালয়, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সামাজিক উপাদান তার জীবনকে প্রভাবিত করে, তবুও তার জীবনের প্রথম পরিবেশের ছাপ শিশুর চাল-চলনে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, মনোভাবে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

পরিবারের একটি বড় কাজ হলো শিশুর সামাজিকীকরণ। পরিবার, পিতৃতন্ত্রের আদর্শানুসারে গড়ে তোলে পুত্র-কন্যাদের, শিখিয়ে দেয় তারা পালন করবে কোনো ভূমিকা, কার মেজাজ হবে কেমন, আর অবস্থান হবে কোথায়।[১] জন্মের পর থেকে শুরু হয় পুত্রকে পুরুষ আর কন্যাকে নারীরূপে দ্বিতীয় জন্ম দেয়া; এবং নারী ও পুরুষ হয়ে ওঠে দুই সংস্কৃতির অধিবাসী। তাদের জীবন, জগৎ, অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই নারী ও পুরুষ, নারী ও পুরুষ হয়ে জন্ম নেয় না, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের নারী ও পুরুষ করে তোলা হয়।[২] এ প্রভেদমূলক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সমতাপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এজন্য মেয়ে-শিশুর প্রতি বিরাজিত বৈষম্যমূলক মনোভাব ও প্রবণতার ব্যাপ্তি চিহ্নিতকরণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

- পরিবার-সমাজ-সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে মেয়ে-শিশুদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক মনোভাব ও প্রবণতা রয়েছে তার ব্যাপ্তি চিহ্নিত করা।
- বৈষম্যের কারণ নিরূপণ করা।
- সমতাপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নে বিরাজমান বৈষম্য কী প্রভাব ফেলছে, তা জানা।

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
** সহকারি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ , নিউ গভ: ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

এলাকা নির্বাচন

গ্রাম-শহর, মুসলমান-হিন্দু, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর ব্যক্তি নিয়েই আমাদের সমাজ। সঙ্গতকারণে সকল স্তরের ব্যক্তি আর বৈষম্যের শিকার মেয়ে-শিশুরা এ গবেষণার আওতাভুক্ত। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে গবেষণার জন্য একটি গ্রাম ও শিহরের একটি মহল্লা নির্বাচন করা হয়।

গ্রাম পরিচিতি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন, সাবেক লা-ভাঙ্গা ইউনিয়নের অন্তর্গত হরিনগর একটি মাঝারি ধরনের গ্রাম। এটি মুসলমান অধ্যুষিত হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সনাতন সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করে। এখানে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষ এবং অধিকাংশ নারীরা বিভিন্ন প্রকার আয়-উপার্জন কর্মে নিয়োজিত। শিবগঞ্জ থানা থেকে ১০ কি.মি. পূর্বে গ্রামটি অবস্থিত।

মহল্লা পরিচিতি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের পৌরসভা কার্যালয় সংলগ্ন ইসলামপুর আবাসিক এলাকাকে নির্বাচন করা হয়। এটি সাধারণ কোনো এলাকা নয়। এখানে ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকের বসবাস। যার অধিকাংশই শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটির ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে মোট ৫৫ জন মেয়ে-শিশুকে তথ্যদাতা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। যাদের ২৫ জন (৪৫.৪৫%) গ্রামের ও ৩০ জন (৫৪.৫৫%) শহরের (সারণি-১)।

ছাত্রীদের শ্রেণিভিত্তিক বিবরণ

	গ্রাম	শহর	মোট
মাধ্যমিক	১৫	১৮	৩৩
	৬০%	৬০%	৬০%
উচ্চ মাধ্যমিক	৭	৮	১৫
	২৮%	২৬.৬৭%	২৭.২৭%
স্নাতক	৩	৪	৭
	১২%	১৩.৩৩%	১২.৭২%
মোট উত্তরদাতা	২৫	৩০	৫৫
	৪৫.৪৫%	৫৪.৫৪%	১০০%

সারণি-১

এছাড়াও ৬৪ জন পিতা-মাতাকেও গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর, চাকুরিজীবী-কৃষক শ্রেণির ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে ৩০ জন (৪৬.৮৭%) গ্রামের ও ৩৪ জন (৫৩.১২%) শহরের। এদের মধ্যে ৩২ জন মাতা ও ৩২ জন পিতা। নির্বাচিতদের মধ্যে ২২ জন (৩৪.৩৭%) নিরক্ষর, ১৮ জন (২৮.১২%) প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ১৬ জন মাধ্যমিক

শিক্ষায় (২৫%) এবং ৮ জন (১২.৫%) উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। এছাড়াও ৩২ জন মায়ের মধ্যে ১৯ জন গৃহিণী (৫৯.৩৭%), চাকুরিজীবি ৬ জন (১৮.৭৫%), শিক্ষক ৫ জন (১৫.৬২%), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ২ জন (৬.২৫%)। অপরপক্ষে ৩২ জন পিতার মধ্যে দিনমজুর/কৃষিশ্রমিক ৯ জন (২৮.১২%), ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৮ জন (২৫%), কৃষক ৪ জন (১২.৫%), চাকুরিজীবী ৯ জন (২৮.১২%) এবং অন্যান্য ২ জন (৬.২৫%)। গ্রামে ১৬ জন পিতার মধ্যে ৪ জন কৃষক, শহরে কেউ পেশা হিসাবে কৃষি উল্লেখ করেনি।

গবেষণাটি পরিচালনার জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা এবং পর্যবেক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত যাচাই, ক্রসচেক ও সমীক্ষিত জনগোষ্ঠীর মতামত, বক্তব্য, পরামর্শ ও প্রস্তাবনা সংগ্রহের জন্য দলগত আলোচনা (FGD) আয়োজন করা হয়। ছাত্রীদের জন্য ক্লোজড প্রশ্নমালা এবং পিতা-মাতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বলা যাবে।[৩] এখানে তাই ১৮ বছরের নিচের বয়সকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। *বৈষম্য* বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় গবেষণাটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়ে-শিশুদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি।

মেয়ে-শিশুর প্রতি বিরাজমান সামাজিক বৈষম্যের ধরন ও ক্ষেত্র

শিক্ষা

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাংলায় নারীদের শিক্ষার যে-ধারা শুরু হয়, তার উদ্দেশ্য নারীকে স্বাধীন স্বায়ত্বশাসিত করা নয়, তার লক্ষ্য উন্নতজাতের স্ত্রী বা শয্যাসঙ্গিনী উৎপাদন।[৪] একটি মেয়ের নিকট পরিবার হল ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবেশের উপযুক্ততা অর্জনের স্থান। তার জীবনের লক্ষ্য 'ভালো স্ত্রী' বা 'ভালো মা'[৫] হওয়া। আর পিতা-মাতার দায়িত্ব তাকে সেভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা। কারণ সে তো বংশের প্রদীপ নয়, বিয়ের পর চলে যাবে স্বামীর ঘরে; পিতা-মাতাকে বৃদ্ধকালে খাওয়াবে না, তার দায়িত্বও নেবে না। সঙ্গতকারণেই পিতা-মাতা তার পড়ালেখায় ততটা গুরুত্ব দেয় না, যতটা দেয়া হয় ছেলেদের ক্ষেত্রে। বর্তমান গবেষণায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠে (সারণি-২)।

শিক্ষায় বৈষম্য সম্পর্কে ছাত্রীদের অভিমত

বাবা-মা কার পড়ালেখায় বেশি গুরুত্ব দেন?	গ্রাম	শহর	মোট
ক) ছেলেদের	৮	১০	১৮
	৩২%	৩৩.৩৩%	৩২.৭২%
খ) মেয়েদের	৫	৮	১৩
	২০%	২৬.৬৭%	২৩.৬৪%
গ) ছেলে-মেয়ে উভয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব দেন।	১২	১২	২৪
	৪৮%	৪০%	৪৩.৬৪%
মোট উত্তরদাতা	২৫	৩০	৫৫

সারণি- ২

৫৫ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৩ জন (২৩.৬৪%) মনে করে পিতা-মাতা তাদের পড়ালেখায় গুরুত্ব দেয়; ২৪ জন (৪৩.৬৪%) মনে করে উভয় সন্তানের পড়ালেখার গুরুত্ব সমান। অপর পক্ষে ১৮ জন (৩২.৭২%) মনে করে পিতা-মাতা ছেলেদের পড়ালেখায় বেশী গুরুত্ব দেয়। যা পড়ালেখায় মেয়ে-শিশুদের প্রতি বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষার খরচ বহন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এ বিষয়গুলো পরিবারকেই সম্পন্ন করতে হয়। দরিদ্র দেশ বলে শিক্ষায় দরিদ্র পরিবারগুলো পিছিয়ে আছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। দরিদ্র পরিবারগুলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে এখানে কুসংস্কার, গোঁড়ামি অপেক্ষাকৃত বেশি, যা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। লেখাপড়া করানোর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে (সারণি-৩ক, খ)।

মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে পিতা-মাতার মতামত

ক) আপনার মেয়েকে কতটুকু লেখাপড়া করাতে চান?	মেয়ে-শিশু			ছেলে-শিশু		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত	৩	১	৪	০	০	০
	১০%	২.৯৪%	৬.২৫%	০.০	০.০	০.০
দশম শ্রেণি পর্যন্ত	১০	১০	২০	৯	৭	১৬
	৩৩.৩৩%	২৯.৪১%	৩১.২৫%	৩০%	২০.৫৯%	২৫%
উচ্চ শিক্ষা দিতে চাই	১৭	২৩	৪০	২১	২৭	৪৮
	৫৬.৬৬%	৬৭.৬৪%	৬২.৫%	৭০%	৭৯.৪১%	৭৫%
মোট উত্তরদাতা	৩০	৩৪	৬৪	৩০	৩৪	৬৪

সারণি-৩ক

খ) কেন পড়ালেখা করাতে চান?	মেয়ে-শিশু			ছেলে-শিশু		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
ভাল বিয়ে দেয়া যাবে	১৫	১০	২৫	৩	২	৫
	৫০%	২৯.৪১%	৩৯.০৬%	১০%	৫.৮৮%	৭.৮১%
ভবিষ্যতে নিজের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারবে	৫	৬	১১	৪	১২	৬
	১৬.৬৬%	১৭.৬৪%	১৭.১৮%	১৩.৩৩%	৩৫.২৯%	৯.৩৭%
মানুষ হয়ে ভালভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে	১০	১৮	২৮	২৩	২০	৫৩
	৫৩.৩৩%	৫২.৯৪%	৪৩.৭৫%	৭৬.৬৬%	৫৮.৮২%	৮২.৮১%
মোট উত্তরদাতা	৩০	৩৪	৬৪	৩০	৩৪	৬৪

সারণি-৩খ

ছেলে ও মেয়েকে কতটুকু পড়ালেখা করাতে চান এ প্রশ্নের উত্তরে মেয়েদের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করাতে চান মাত্র ৪ জন (৬.২৫%) অভিভাবক, যেখানে ছেলে-শিশুদেরকে কেউ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতে চান না। দশম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদেরকে লেখাপড়া করাতে চান ২০ জন (৩১.২৫%) যা ছেলেদের ক্ষেত্রে (২৫%) ভাগ। অপরপক্ষে মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষা দিতে চান ৪০ জন (৬২.৫%) যেখানে ছেলেদেরকে উচ্চশিক্ষা দিতে চান ৪৮ জন (৭৫%) । এ থেকেও ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যে বৈষম্য তাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। সন্তানদের লেখাপড়া কেন করাতে চান? এ প্রশ্নের উত্তরেও ছেলে ও মেয়ে শিশুর প্রতি অভিভাবকদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ভাল বিয়ে দেয়া যাবে এজন্য মেয়েকে পড়ালেখা করাচ্ছেন ২৫ জন (৩৯.০৬%) অভিভাবক, যা ছেলের ক্ষেত্রে মাত্র (৭.৮১%) ভাগ। পক্ষান্তরে উচ্চশিক্ষিত হয়ে ভালভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে- এজন্য মেয়েদেরকে পড়ালেখা করাচ্ছেন ২৮ জন (৪৩.৭৫%) অভিভাবক, যা ছেলেদের ক্ষেত্রে ৫৩ জন (৮২.৮১%)। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিভাবকই ছেলেদেরকে ভবিষ্যতে কর্মজীবনে ভালো করার ইচ্ছায় লেখাপড়া করাতে চান। বস্তুত, এজন্যেই ছেলে ও মেয়েদের লেখাপড়ায় পার্থক্য হয়ে থাকে। উপরের উপাত্ত হতে স্পষ্ট যে মেয়ে-শিশুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে যা তাদের পড়ালেখাকে প্রভাবিত করে।

খাদ্য ও পুষ্টিঃ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবারে নারীরা সাধারণত অবশিষ্ট শ্রেণি। অতিথি, পুরুষ ও ছোটরা আহারের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই জুটে নারীদের ভাগ্যে। এটা আমাদের সমাজে সাধারণ একটি ব্যাপার। এর ব্যতিক্রম অশোভনীয়, প্রত্যেক মা চান তার মেয়ে এ প্রথা মেনে 'আদর্শ মেয়ে' হিসাবে নিজেকে তৈরি করুক। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই, আছে খাবারের টানাটানি। আর এ সীমিত খাবারে যারা বঞ্চিত হয় তারা নারী। পুরুষের তুলনায় নারীরা ক্যালোরি ও আমিষ উভয়ই কম গ্রহণ করে। পুরুষ দৈনিক ক্যালোরি ও আমিষ গ্রহণ যেখানে ১৯২৭ ক্যালোরি ও ৪১.৪ গ্রাম; মহিলাদের সেখানে ১৫৯৯ ক্যালোরি ও ৩২.৭ গ্রাম। খাদ্য থেকেই আসে পুষ্টি। আর মেয়েরা খাদ্য গ্রহণে বঞ্চনার শিকার, ফলে তারা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে। ছেলে-শিশুরা যেখানে (৫.০%) অপুষ্টির শিকার, মেয়ে-শিশুরা সেখানে (১৪.০%) ।[৫] খাবারে যে বৈষম্য রয়েছে তা বর্তমান গবেষণাতেও পাওয়া যায়(সারণি-৪)।

খাবারে বৈষম্য সম্পর্কে ছাত্রীদের অভিমত

মা খাবারের সময় মাছ, মুরগির ভালো অংশ কাকে বেশি দেন?	গ্রাম	শহর	মোট
ক) ছেলেদের	১৪	১৬	৩০
	৫৬%	৫৩.৩৩%	৫৪.৫৪%
খ) মেয়েদের	৪	৫	৯
	১৬%	১৬.৬৭%	১৬.৩৬%
গ) ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমানভাবে	৭	৯	১৬
	২৮%	৩০%	২৯.০৯%
মোট উত্তরদাতা	২৫	৩০	৫৫

সারণি-৪

গ্রাম ও শহরের মোট ৫৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ৩০ জন মনে করে, তাদের মা খাবারের সময় ভালো অংশ ছেলেদের দেন যা শতকরা (৫৪.৫৪%), মাত্র ৯ জন (১৬.৩৬%) মেয়েরা মনে করে মা খাবারের সময় ভালো অংশ তাদেরকে দেয়। অপরপক্ষে ১৬ জন (২৯.০৯%) মনে করে ছেলে ও মেয়ের খাবারে কোনো তফাৎ নেই। তবে এ বৈষম্য শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি। খাবারে ছেলেদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি পিতা-মাতারাও স্বীকার করেন (সারণি-৫)।

খাবারের বৈষম্য সম্পর্কে মাতা-পিতার মতামত

খাবার পরিবেশনে সাধারণত	মাতা	পিতা	মোট
ছেলেকে বেশি ভালো অংশ দেওয়া হয়	১৭	১৯	৩৬
	৫৩.১২%	৫৯.৩৭%	৫৬.২৫%
মেয়েকে বেশি ভালো অংশ দেওয়া হয়	৫	৫	১০
	১৫.৬২%	১৫.৬২%	১৫.৬২%
ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান দেয়া হয়।	১০	৮	১৮
	৩১.২৫%	২৫%	২৮.১২%
মোট উত্তরদাতা	৩২	৩২	৬৪

সারণি-৫

৬৪ জন অভিভাবকদের মধ্যে ৩৬ জন (৫৬.২৫%) মনে করেন খাবার পরিবেশনে ছেলে সন্তানকে ভালো অংশ দেয়া হয়। ১৮ জন (২৮.১২%) মনে করেন খাবারে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান অংশ দেয়া হয়, মাত্র ১০ জন (১৫.৬২%) মনে করেন খাবারে মেয়েকেই ভাল অংশটি দেয়া হয়। গবেষণায় দেখা যায় খাবারের ক্ষেত্রে নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত পরিবারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারে এ মাত্রাটা কম।

স্বাস্থ্যঃ মেয়েরা যেহেতু কম খাদ্য ও কম পুষ্টি পেয়ে থাকে তাই তারা রোগেও ভোগে বেশি। কিশোরীদের শারীরিক অসুস্থতার বিরাট অংশ রজঃস্রাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন- ঋতু চলাকালে ভীষণ পেটব্যথা, রজঃস্রাবের পর অপুষ্টি জনিত দুর্বলতা। রজঃস্রাবের পর কারও ভীষণ ব্যথাসহ শ্বেতরক্তক্ষরণ হয় প্রভৃতি। মাসিক এ রজঃস্রাব মেয়েদের একটি স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার হলেও এ নিয়ে গ্রামবাংলায় রয়েছে নানান কুসংস্কার। রজঃস্রাবকালে মেয়েরা অশুভ শক্তির শিকার হয়ে পড়ে ফলে তাদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ সময়ে মেয়েরা কোনো ধর্ম-কর্ম করবে না, উপাসনালয়ে প্রবেশ করবে না, ধর্মগ্রন্থ ছোঁবেনা, ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না। এ সময় তাদের মাছ, মাংস, ডিম, কলা ইত্যাদি খেতে নেই।[৬] এসব বিশ্বাস ও আচরণের কারণে কিশোরীদের চলাচল সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং খাওয়া-দাওয়ার বিধি-নিষেধের জন্য তারা পুষ্টির অভাবে ভোগে। পক্ষান্তরে মেয়েরা স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার যা বর্তমান গবেষণাতেও দেখা যায়। ৫৫ জন ছাত্রীর মধ্যে যদিও অধিকাংশই শারীরিক বিশেষ অসুস্থতায় (রজ:স্রাবে) ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করায়। তবে কিছু সংখ্যক কষ্ট হলেও কোনো প্রকার চিকিৎসা করায় না, অপরপক্ষে ৯ জন (১৬.৩৬%) সনাতনী পদ্ধতিতে চিকিৎসা করায়।

শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে মা-বাবা কার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন। এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশই পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয় তবে ৬৪ জন পিতামাতার মধ্যে

১০ জন (১৫.৬২%) মেয়েদের ক্ষেত্রে আর ১৮ জন (২৮.১২%) ছেলেদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয় যা মেয়েদের প্রতি বৈষম্যই প্রকাশ করে। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুবিধা হলেও মেয়েদের চাইতে দ্বিগুণেরও অধিক ছেলেদেরকে আনা হয় এবং মেয়েদের তুলনায় অনেক ঘন ঘন পুরুষদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৭] ছেলে-সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকে বলে, পিতা-মাতার দৃষ্টি ছেলে-সন্তানদের প্রতি। ফলে তাদের রোগ-বালাই এর প্রতি বেশি মনোযোগী হয় তারা (সারণি-৬)।

স্বাস্থ্য সেবায় বৈষম্য সম্পর্কে পিতা-মাতার মতামত

কার অসুস্থতায় বেশি গুরত্ব দেয়া হয়	মাতা	পিতা	মোট
ছেলে-সন্তানের	৯	৯	১৮
	২৮.১২%	২৮.১২%	২৮.১২%
মেয়ে-সন্তানের	৪	৬	১০
	১২.৫%	১৮.৭৫%	১৫.৬২%
ছেলে-মেয়ে উভয় সন্তানের	১৯	১৭	৩৬
	৫৯.৩৭%	৫৩.১২%	৫৬.২৫%
মোট উত্তরদাতা	৩২	৩২	৬৪

সারণি-৬

পোশাক-পরিচ্ছদঃ লিঙ্গভিত্তিক কর্মবিভাজন সৃষ্টির পর ক্রমান্বয়ে পোশাকেও পার্থক্য সূচিত হয়। পুরুষ তাদের কাজের ও ঘোরাফেরার সুবিধা অনুযায়ী পোশাক পছন্দ করে। আর মেয়েরা সন্তান লালন-পালন ও গৃহকর্মের সুবিধা অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করে। এভাবেই পোশাকে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।[৮] ফ্যাশান, আর্থিক সামর্থ্য, ধর্ম ও সমাজ বিবেচনা করেই আমাদের দেশে পোশাক পরার বিধান রয়েছে। এজন্যই ছেলে ও মেয়ের পোশাক-পরিচ্ছদে তারতম্য ঘটে। ছেলে স্কুল-কলেজে যাবে, বাইরে খেলাধুলা করবে, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাবে, তাই তারাই সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক পরবে এটি পিতা-মাতার কামনা। এরূপ আকাঙ্ক্ষার কারণে ছেলেরা পাশ্চাত্যের পোশাক পরলেও তা দৃষ্টিকটু না হয়ে বরং স্মার্ট হিসেবে বিবেচিত ও গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হল মেয়েরা ঘরে থাকবে, তারা বাইরে ঘোরাফেরা করতে যাবে না, তাই তাদের মোটামুটি মানের পোশাক হলেও চলে। তাছাড়া মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই হতে হবে। কারণ আধুনিক বা পাশ্চাত্যের পোশাক হলে তা উচ্ছৃঙ্খলতা বলেই বিবেচিত। তাই পোশাক-পরিচ্ছদে মেয়েদের রুচি-অরুচি কখনও গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের সমাজে। ছোটবেলা থেকেই পিতা-মাতারা মেয়েদের জন্য নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক ক্রয় করে।

৬৪ জন পিতা-মাতার মধ্যে ১৫ জন (২১.৮৭%) নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী মেয়েদের জন্য পোশাক ক্রয় করে। অর্থাৎ এরা মেয়েদেরকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক পরিধানে বিশ্বাসী। অপরপক্ষে ১৭ জন (২৮.১২%) পিতা-মাতা তাদের পছন্দমত পোশাক ছেলে-সন্তানের জন্য

নির্বাচন করে। অর্থাৎ পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মেয়েদের স্বাধীনতা ছেলেদের তুলনায় অনেক কম যা বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ (সারণি-৭)।

পোশাকে বৈষম্য সম্পর্কে পিতা-মাতার মতামত

পোশাক কেনায় কে বেশি গুরত্ব পায়?	মাতা	পিতা	সর্বমোট
ছেলেরা	৯	৮	১৭
	২৮.১২%	২৫%	২৮.১২%
মেয়েরা	৮	৭	১৫
	২৫%	২১.৮৭%	২১.৮৭%
ছেলে-মেয়ে উভয়ে সমান	১৫	১৭	৩২
	৪৬.৮৭%	৫৩.১২%	৫০%
মোট উত্তরদাতা	৩২	৩২	৬৪

সারণি-৭

চলাফেরাঃ আমাদের সমাজে একজন ছেলে যেভাবে পাড়া-মহল্লা গ্রামে-হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াতে পারে একটি মেয়ে কি সেভাবে পারে? আসলে পুরোপুরি পারে না; বা তাকে বেড়াতে দেয়া হয় না। সমীক্ষায় তাই পাওয়া যায় (সারণি-৮)।

চলাফেরায় বৈষম্য সম্পর্কে ছাত্রীদের মতামত

আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় তুমি কি ছেলেদের সমান সুযোগ পাও?	গ্রাম	শহর	মোট
ক) হ্যাঁ সুযোগ পাই	৪	৬	১০
	১৬%	২০%	১৮.১৮%
খ) না, ছেলেদের সমান সুযোগ পাই না	২১	২৪	৪৫
	৮৪%	৮০%	৮১.৮১%
মোট উত্তরদাতা	২৫	৩০	৫৫

সারণি-৮

৫৫ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১০ জন (১৮.১৮%) বলেছে তারা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় ছেলেদের সমান সুযোগ পায়। আর ৪৫ জন (৮১.৮১%) বলেছে তারা ছেলেদের সমান সুযোগ পায় না। মেয়েদের চলাফেরার বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও খারাপ।

ঘরের বাইরে বেড়াতে যাওয়া, ঘোরাফেরা করা, বাজারে যাওয়া এসব যেন ছেলেদের জন্যই। আর বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এ বৈষম্যের ফলে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে এ বোধ দাঁড়িয়েছে, মেয়েরা ঘরে থাকবে আর ছেলেরা বাইরে যাবে। মাতা-পিতারাও মনে করেন, ছোটবেলায় বাইরে মেয়েরা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করলে বড় হয়েও অভ্যাস থেকে যাবে, যা মান-সম্মানের জন্য ক্ষতিকর। তাই তারা চান ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা ঘরে থাকার অভ্যাস করুক। সেজন্য মেয়েদের ওপর চলাফেরায় নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। যা বৈষম্যে

তৈরিতে ভূমিকা রাখে। স্বাধীনভাবে চলাফেরায় ছেলেরা যে বেশি সুযোগ পায় তা মাতা-পিতার মতামত থেকেও বুঝা যায় (সারণি-৯)।

চলাফেরায় বৈষম্য সম্পর্কে পিতা-মাতার মতামত

আতীয় স্বজনের বাড়ী যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় কে বেশি সুযোগ পায়?	মাতা	পিতা	সর্বমোট
ছেলেরা	১৯	২০	৩৯
	৫৩.৩৭%	৬২.৫%	৬০.৯৩%
মেয়েরা	৫	৫	১০
	১৫.৬২%	১৫.৬২%	১৫.৬২%
ছেলে-মেয়ে উভয়ে সমান	৮	৭	১৫
	২৫%	২১.৮৭%	২৩.৪৩%
মোট উত্তরদাতা	৩২	৩২	৬৪

সারণি -৯

৬৪ জন মাতা-পিতার মধ্যে ১০ জন (১৫.৬২%) মনে করেন মেয়েরা বেশি সুযোগ পায়, ১৫ জন (২৩.৪৩%) মনে করেন উভয়ে সমান সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে ৩৯ জন (৬০.৯৩%) মনে করেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরায় ছেলেরাই বেশি সুযোগ পায়।

খেলাধুলা ও বিনোদনঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতা-মাতারা চান তাদের সন্তানেরা খেলাধুলায় মনোনিবেশ না করে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করুক। কারণ তারা খেলাধুলাকে পড়ালেখার অন্তরায় হিসেবে মনে করে। ছেলেরা কখনো পিতা-মাতার ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় খেলাধুলার সুযোগ পায়, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ মেলে না। খেলাধুলা করলে ছেলেদের ক্ষেত্রে মনে করা হয়, পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটবে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে পড়ালেখার ব্যাঘাতসহ শরীরের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাবে যা কোমল নারী হওয়ার পক্ষে অন্তরায়। সেজন্যই মেয়েদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে সামান্যই অনুমতি মেলে। খেলাধুলা ছাড়াও টিভি দেখাসহ বিভিন্ন বিনোদনের ক্ষেত্রেও মেয়েদের সুযোগ কম। বিনোদনের ক্ষেত্রেও মেয়েরা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা গবেষনায় পাওয়া যায় (সারণি-১০)।

বিনোদনে বৈষম্য সম্পর্কে ছাত্রীদের অভিমত

খেলাধুলা, টিভি দেখাসহ বিভিন্ন বিনোদনের ক্ষেত্রে কে বেশি সুযোগ পায়?	গ্রাম	শহর	মোট
ক) ছেলেরা	১৯	২২	৪১
	৭৬%	৭৩.৩৩%	৭৪.৫৪%
খ) মেয়েরা	২	০	২
	৮%	০%	৩.৬৩%
গ) ছেলে ও মেয়ে উভয় সমান	৪	৮	১২
	১৬%	২৬.৬৭%	২১.৮১%
মোট উত্তরদাতা	২৫	৩০	৫৫

সারণি-১০

৫৫ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২ জন (৩.৬৩%) মনে করে খেলাধুলা, টিভি দেখা সহ বিভিন্ন বিনোদনে মেয়েরা বেশি সুযোগ পায় এবং ১২ জন (১৮.৪৬%) মনে করে উভয়ে সমান সুযোগ পায়। কিন্তু ৪১ জন (৭৪.৫৪%) মনে করে টিভি দেখা সহ বিভিন্ন বিনোদনে ছেলেরাই বেশি সুযোগ পায়। আধুনিককালে বিনোদনের অন্যতম উপকরণ হল টিভি। টিভি গৃহের অভ্যন্তরে থাকে বিধায় মেয়েদের উপভোগের সুযোগ বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা হল পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা। অতিথিদের আপ্যায়ন করানোর দায়িত্ব প্রায় এককভাবে মেয়েদের, এছাড়াও বড়দের এক গ্লাস পানি দেওয়া কিংবা ছোট শিশুরা কান্নাকাটি বা বিরক্ত করলে তাকে সরিয়ে নেয়া বা ম্যানেজ করার দায়িত্ব মেয়েদেরকেই পালন করতে হয় যা ধারাবাহিক টিভি দেখার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে, যেটা সাধারণত ছেলেদের ক্ষেত্রে হয় না। তাছাড়া দারিদ্র্যতার কারণে অনেকেই টিভি ক্রয় করতে পারেনা। ফলে ছেলেরা ক্লাবে বা বাজারে যেয়ে টিভি দেখার সুযোগ পায় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে এটা অসম্ভব একটা বিষয়।

মেয়ে-শিশুর প্রতি বৈষম্যের কারণ

পিতা-মাতার প্রত্যাশা

বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তানেরা পিতা-মাতার ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে বৃদ্ধবয়সে পিতা-মাতাও ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার জন্য সন্তানের ওপর নির্ভরশীল ফলে উভয়ের একপ্রকার স্বার্থ আছে। এখন প্রশ্ন হল পিতা-মাতার স্বার্থ কার দ্বারা পূরণ হবে? ছেলে না মেয়ের দ্বারা? আমাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী মেয়েরা বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি যায়, স্বামীর সংসার করে, নতুন সংসারকে নিজের করে নেয়। যে মেয়ে এ কাজটি করতে পারে সেই "আদর্শ মেয়ে",[৯] সুতরাং পিতা-মাতার দায়িত্ব বহনের সুযোগ কোথায়। অপরপক্ষে, বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ছেলেদেরকেই বহন করতে হয়। এ নির্ভরশীল সম্পর্কের জন্য পিতা-মাতার আশা-ভরসার স্থল পুত্রসন্তান, এটি সামাজিক বাস্তবতা। একজন মহিলার পাঁচ মেয়ের পর এক ছেলে এবং তারপর বাচ্চা হওয়া বন্ধ। কোনো মহিলার তিন মেয়ের পর এক ছেলে আর তারপর বাচ্চা হওয়া বন্ধ। আবার কোনো মহিলার সাত মেয়ের পর এক ছেলে এবং তারপর বাচ্চা হওয়া বন্ধ, এর মানে কী? মানে সেই একটাই, ছেলে না হওয়া পর্যন্ত মহিলার নিস্তার নেই। খুব ভাগ্যবতী হলে প্রথমেই যদি ছেলে হয়ে যায় তো তার নিস্তার মিলল সহজে।[১০]

গবেষণায় দেখা যায় ৬৪ জন পিতা-মাতার মধ্যে ৪৮ জন(৭৫%) প্রথম সন্তান আশা করেছিল - ছেলে। মাত্র ১৬ জন (২৫%) আশা করেছিল মেয়ে। এর মধ্যে পুত্র-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা মায়েদের সর্বাধিক। ৩২ জন মায়ের মধ্যে ২৫ জন (৭৮.১২%) প্রথম পুত্র-সন্তান আশা করেছিল। আর পিতাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল ২৩ জনের (৭১.৮৮%) । শহরের তুলনায় গ্রামের মাতা-পিতাদের পুত্র-সন্তানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বেশি; গ্রামে পুত্র-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা (৭৬.৬৭%), আর শহরে(৭৩.৫২%) শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায় পিতা-মাতার পুত্র-সন্তানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কত তীব্র (সারণি-১১)।

পুত্র-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা

প্রথম সন্তান আশা করেছিলেন	মাতা	পিতা	সর্বমোট
ছেলে	২৫	২৩	৪৮
	৭৮.১২%	৭১.৮৮%	৭৫%
মেয়ে	৭	৯	১৬
	২১.৮২%	২৮.১২%	২৫%
মোট উত্তরদাতা	৩২	৩২	৬৪

সারণি-১১

কেন পুত্র-সন্তান চান? এ প্রশ্নের উত্তরে ৬৪ জন পিতা-মাতার মধ্যে ৩৩ জন (৫১.৫৬%) বলেন ছেলে বংশের বাতি, তাই বংশ রক্ষা হয়, যা মোট উত্তরদাতার অর্ধেক। ৮ জন (১২.৫%) বলেন মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া। আর ২৩ জন (৩৫.৯৪%) বলেন বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য পুত্র-সন্তানের প্রত্যাশা। ছেলে বংশের বাতি তাই বংশরক্ষা হয় এ উত্তরদাতাদের মধ্যে মাতার হার বেশি। মাতাদের (৫৩.১২%) শতাংশ এ উত্তর দেয় যা পিতাদের ক্ষেত্রে (৫১.৫৬%) শতাংশ (সারণি-১২)

কেন পুত্র সন্তান চান?

কেন পুত্র সান্তান চান?	মাতা	পিতা	সর্বমোট
ছেলে বংশের বাতি, তাই বংশ রক্ষা হয়	১৭	১৬	৩৩
	৫৩.১২%	৫০%	৫১.৫৬%
বিয়ে দেবার ঝামেলা থেকে চিন্তামুক্ত হওয়া	৩	৫	৮
	৯.৩৭%	১৫.৬২%	১২.৫%
বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা দেয় বলে	১২	১১	২৩
	৩৭.৫%	৩৪.৩৭%	৩৫.৯৩%
মোট উত্তরদাতা	৩২	৩২	৬৪

সারণি -১২

উভয় সারণি থেকে দেখা যায় পুত্র-সন্তানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা মায়েদের বেশি। ছেলে হল বংশের বাতি তাই বংশ রক্ষা হয়। ছেলে হলে সকলেই খুশি হয়, ফলে সংসারে তার মর্যাদা ও কদর বাড়ে। পক্ষান্তরে মেয়ে হলে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতে হয় সমাজ সংসারে। তাই পিতা-মাতারা চান না তার মেয়ে অনুরূপ, শোষণ-লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কিংবা নিপীড়নের শিকার হোক। মেয়ে-সন্তান মানুষ করা ও বিয়ে দেয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া। আর "বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা পাওয়ার আশা" এবং "বংশ রক্ষা করা" প্রভৃতি কারণে পিতা-মাতার আকাঙ্ক্ষা থাকে ছেলে-সন্তানের। ছেলে-সন্তান প্রাপ্তির এ "তীব্র আকাঙ্ক্ষাই" মেয়ে-সন্তানের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

যৌতুক

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যৌতুক এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। যৌতুকের জন্য মেয়ের পরিবার চরম ভোগান্তির শিকার হয়। ধনী পিতা-মাতারা যৌতুকের চাহিদা পূরণ করে কন্যাকে বিয়ে

দিতে পারলেও দরিদ্র পিতা-মাতা জমি-জমা বিক্রি করেও রক্ষা পায় না, অনেক সময় ঋণ নিয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। আর যে সকল পরিবারে একাধিক মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত থাকে তাদের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। ভবিষ্যতে বিয়ে দিতে যৌতুক লাগবে এজন্যে মেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকেই পরিবারের আপনজন কর্তৃক কঠিন মন্তব্য শুনতে হয়, যা এক প্রকার হয়রানি। এরূপ মন্তব্য মেয়ে-শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ফল। বস্তুত যৌতুক এক ভয়াবহ মরণব্যাধি। এর জন্য মেয়ে বিয়ে দেয়ার যে ঝামেলা, হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তা থেকে চিন্তামুক্ত হতেই পুত্রসন্তান কামনা করে। সঙ্গতকারণে মেয়ে সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা জন্মে, যা মেয়েদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

নীরবতার সংস্কৃতি

মেয়ে-শিশুদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল নীরবতার সংস্কৃতি (Culture of Silence)। পিতা-মাতা চায় ছোটবেলা থেকেই মেয়ের ধৈর্য্য ক্ষমতা বৃদ্ধি পাক। কোনো অন্যায় অনিয়ম নিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মেয়েদের সাজেনা, এগুলো ছেলেদের কাজ। যে মেয়ে মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করতে পারে সে নম্র-ভদ্র-বিনয়ী। এরূপ বোধ নিয়ে লালিত-পালিত মেয়েটি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় নীরবতার সংস্কৃতি। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের সম্মুখীন না হলে অন্যায় অনিয়ম বেড়ে যায়। যা বৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

দারিদ্র্যতা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে মেয়েরা যে সকল বৈষম্যের শিকার হয় সেগুলোকে ব্যাপকতা দেয় দারিদ্র্যতা। দরিদ্র পরিবারগুলো খাদ্য ও পোশাকের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে হিমশিম খায়।এছাড়াও স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণ করতে তারা অপরাগ। সেখানে শিক্ষা, তাদের কাছে বিলাসিতা তুল্য। বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হল পুরুষ। সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খরচগুলো পরিবারকে বহন করতে হয়। আর বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার জন্য ছেলে-সন্তানের ওপর নির্ভর করতে হয় পিতা-মাতাকে। তাই পিতা-মাতা অগ্রাধিকার দেয় পুত্র-সন্তানকে। যার প্রভাবে ছেলে-শিশুরা খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও চলাফেরাসহ সবকিছুতেই বেশি সুযোগ পেয়ে থাকে আর বৈষম্যের শিকার হয় মেয়ে-শিশুরা।

শিক্ষার অভাব

শিক্ষা মানুষের সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, যৌক্তিক ও নায্য আচরণ করতে শেখায়। আর নিরক্ষরদের নিত্যসঙ্গী হলো কুসংস্কার ও গোঁড়ামি। পিতা-মাতার অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাবে মেয়ে-শিশুরা বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের শিকার হয়। বর্তমান গবেষণাতেও শিক্ষার প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। উচ্চশিক্ষিত পিতা-মাতারা তাদের ছেলে ও মেয়ে উভয় সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দিতে চান। কিন্তু নিরক্ষর সকল পিতামাতা তাদের মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিতে চান না। বাস্তবিক অর্থেই শিক্ষার অভাব মেয়ে-শিশুদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা

অশিক্ষা-অপশিক্ষা-দারিদ্র্যতা প্রভৃতি কারণে পরিবারের মধ্যে টানাপড়েন ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন শিথিল হয়, ফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হতাশা নেমে আসে যা তাদের মানসিক সুস্থতার অন্তরায় । পারিবারিক বন্ধন শিথিল হলে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রী-সন্তানদের রেখে অন্যত্র চলে যায়। তখন একা মায়ের পক্ষে সম্ভব হয় না তার ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান ভাবে মানুষ করা। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন আসে। সঙ্গতকারণে অগ্রাধিকার পায় ছেলে আর বঞ্চিত হয় মেয়ে। যা মেয়ে-শিশুর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

মেয়ে-শিশুর প্রতি বৈষম্যের প্রভাব

কন্যাভ্রূণ হত্যা

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে সভ্যতা একদিকে যেমন সুখশান্তি, সমৃদ্ধময় হয়ে উঠছে, অপরদিকে মানুষের হিংস্রতাও যেন চরম আকার ধারণ করছে। আধুনিককালে আল্ট্রাসনোগ্রাফি মানবদেহের রোগ সনাক্তকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞানের এ প্রযুক্তির মাধ্যমে গর্ভস্থ্য সন্তানের অবস্থান ও তার লিঙ্গ নির্ণয় করা যায়। এর ফলে কন্যাসন্তান চান না এমন পিতা-মাতারা সন্তান ভূমিষ্ঠের আগেই কন্যাভ্রূণ বিনষ্ট করে ফেলছেন। আশির দশকে ভ্রূণ হত্যার বিষয়টি শহরাঞ্চলে শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তা অনেক বিস্তৃত।[১১] গ্রামাঞ্চলে এ আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে প্রায় সকল স্তরের মধ্যে গর্ভস্থ্য কন্যাভ্রূণ বিনষ্টের ঘটনা ঘটে চলছে।

শিশু নির্যাতন

মেয়েরা পরিবার ও সমাজে অধঃস্তন মর্যাদার অধিকারী। এরূপ অধঃস্তনতা নারীর ওপর শোষণ-বঞ্চনাসহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এর ফলে কন্যাভ্রূণ হত্যা ও মেয়ে-শিশু হত্যার মত অমানবিক কাজগুলো হচ্ছে। প্রচার মাধ্যমে সবগুলো না এলেও কন্যাসন্তান জন্মদানের অপরাধে প্রসূতিকে নির্যাতন করা এবং নবজাতককে হত্যা করা আমাদের দেশে আজও ঘটে চলেছে।[১২] মেয়ে-শিশুর প্রতি নির্মমতা, বরবর্তা কোনো কালেই কম ছিল না, আধুনিক যুগে এসে এসব প্রতিরোধে নানাবিধ আন্দোলন হচ্ছে, আইন হয়েছে তবে শিশু নির্যাতন পুরোপুরি বন্ধ করা যায় নি। এসব অপরাধ এখনো চলছে যদিও সে সবের অনেক কিছুই প্রকাশিত হয় না।

ধর্ষণ

মেয়ে-শিশুর প্রতি সংঘটিত নৃশংসতার মধ্যে ধর্ষণ খুবই ভয়াবহ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার কারণে মেয়ের জীবনে ধর্ষণ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও নাজুক ব্যাপার। অথচ সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে তা যেন ক্রমেই বেড়ে চলছে। এটা এক ধরনের যৌনবিকৃতি। পুরুষের যৌন লালসা নিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। নিষ্পাপ শিশুর অসহায়ত্ব, অবুঝতাকে পুঁজি করে ঘরে-বাইরে পুরুষ তার যৌনলালসা নিবৃত্তি ঘটায়।[১৩] ২০১১ সালে ৫৭২টি ঘটনা প্রচার মাধ্যমের প্রতিবেদনে আসে যেখানে ৩৪২টি শিশু একজন কর্তৃক ধর্ষণ, ১৮৯টি গণধর্ষণ এবং ৪১টি ধর্ষণের প্রচেষ্টার ঘটনা ঘটে।[১৪] মা-বাবাকে বেঁধে মেয়েকে, চাকরির প্রলোভনে আটকে রেখে, নির্জনস্থানে আটকে রেখে

ধর্ষণ কিংবা কন্যাশিশুকে ফুসলিয়ে ধর্ষণ বা গণধর্ষণ এখন পত্র-পত্রিকায় অনেকটা নৈমিত্তিক ঘটনা।

অ্যাসিড নিক্ষেপ

মেয়ে-শিশুদের প্রতি নির্যাতনের আলোচিত একটি রূপ হল অ্যাসিড নিক্ষেপ। অ্যাসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে মেয়েদের শরীর ও মুখ ঝলসে দেয়া হয়। প্রেমের ডাকে সাড়া না দেওয়া, কুপ্রস্তাব প্রত্যাখান করলে কিংবা অন্য কোনো কারণে মেয়েদের প্রতি ক্রোধান্বিত পুরুষ সাধারণত রাতের আঁধারে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে চলে যায়। ২০১১ সালে নারী নির্যাতন বিষয়ক কেসের শ্রেণিবিন্যাস থেকে দেখা যায়- ২৩২টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।[১৫] বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতার কারণে অ্যাসিড নিক্ষেপের অধিকাংশ ঘটনার থানায় কেস হয় না।

যৌন হয়রানি

রাস্তাঘাটে চলাফেরায় তিরস্কার, উপহাস করা, মেয়েদের শিস দেয়া, ছলে-বলে-কৌশলে ক্যামেরা কিংবা মোবাইলের মাধ্যমে নারীর নগ্নছবি তুলে টাকা আদায়, বিয়ে করতে বা অন্য কোনো কাজ করতে বাধ্য করাসহ নানারকম নিপীড়ন-হয়রানির শিকার হতে হয় মেয়ে-শিশুদের।[১৬] এছাড়াও রাস্তাঘাটে বখাটে ছেলেদের দ্বারা তারা হয়রানির শিকার হয়ে থাকে।

শিশু পতিতাবৃত্তি

পতিতালয় পরিচালনাকারীদের নিকট খদ্দের আকৃষ্ট করার জন্য কিশোরী পতিতা খুবই পছন্দ। আর তাই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেয়ে-শিশুদের বিভিন্ন প্রলোভনে ফেলে নিয়ে আসে দালালরা। পরে বিক্রি করে পতিতালয়ে।[১৭] পতিতালয় ছাড়াও আরো অনেক ছোট আকৃতির (মিনি পতিতালয়) রয়েছে। অভিজাত শ্রেণি সাধারণত এসব পতিতাকেন্দ্রের খদ্দের। পতিতালয় যে আকারের আর যেভাবেই পরিচালিত হোক না কেন, পতিতাদের সিংহভাগ প্রলোভনে, প্রতারিত হয়ে আসে এবং পতিতা হয়ে কাজ শুরু করে বা বাধ্য হয়, আর এদের একটা বড় অংশ অপ্রাপ্তবয়স্কা।

মানসিক বিকাশ ব্যাহত

ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ছেলে-মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর কতগুলো ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। এ দক্ষতা মানসিক ও সামাজিক। মানসিক দক্ষতার মধ্যে রয়েছে, সূক্ষ্মচিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা ইত্যাদি। আর সামাজিক দক্ষতা হল সকলের সাথে সুসম্পর্ক রাখার গুণাবলী। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা যতই উপরের শ্রেণীতে উঠতে থাকে ততই তারা জীবন-দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে[১৮] কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় মেয়েরা শিক্ষায় চরম বৈষম্যের শিকার। উপরের শ্রেণিতে মেয়েদের সংখ্যা কমতে থাকে। এ ছাড়াও মেয়েরা চলাফেরা ও আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ কম পায়। যা তাদের সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা অর্জনের অন্তরায়। এসব বিষয় ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ব্যক্তিত্ব হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না। ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান ধাপ হল ব্যক্তির মধ্যে আস্থা (Confidence) সৃষ্টি হওয়া। আস্থাসৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন এবং সে যোগ্যতা কাজে লাগানোর সুযোগ অপরিহার্য।

সিদ্ধান্ত তৈরিতে মতামত প্রদান করলে ব্যক্তির মধ্যে আস্থা তৈরি হয় যা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক-সংস্কৃতির বঞ্চনার শিকার মেয়েদের মধ্যে তাই ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে সৃষ্টি হয় না। সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার জন্যে যে মানসিক বিকাশের প্রয়োজন, তা হয় না। আমাদের সমাজে মেয়েরা কখনো পিতার ওপর, কখনো স্বামীর ওপর আবার কখনো মা তার ভরণপোষণের জন্য ছেলের ওপর নির্ভরশীল থাকে। আমাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে মেয়েরা নানা স্তরে বিভিন্নভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল । এতে নারীদের মধ্যে নির্ভরশীল মন-মানসিকতার জন্ম নেয়। এ নির্ভরশীলতা মেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধের জন্ম দেয়, সৃষ্টি হয় আস্থাহীনতার (Lack of Confidence), যা মেয়েদের সামগ্রিক বিকাশকে ব্যাহত করে চরমভাবে।

কর্মদক্ষতা অর্জনে বাধা

মানসিক পূর্ণ বিকাশ ঘটার সুযোগ না পাওয়া এবং বিভিন্ন প্রকার নিপীড়নের শিকার মেয়ে-শিশুদের, লেখাপড়া ও কাজকর্মে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পূর্ণ সহযোগিতার অভাবে তারা পড়ালেখায় পিছিয়ে যায় এবং কর্মক্ষেত্রে ভালো করতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই চলাফেরা ও খেলাধুলাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ কম পাওয়ায় মেয়েদের মধ্যে জড়তা থেকে যায়, যা কর্মদক্ষতা অর্জনে বিরাট অন্তরায়।

জাতীয় উন্নয়ন নিবারিত

সমগ্র গবেষণাব্যাপী বর্ণিত হয়েছে যে মেয়ে-শিশুরা কত ব্যাপক ও বিচিত্র ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং বৈষম্যের কারণ কত গভীর। পারিবারিক বৈষম্যেই একজন মেয়েকে মানসিকভাবে বিকশিত হতে সুযোগ দেয় না, দেয় না একজন পূর্ণাঙ্গ কর্মক্ষম মানুষ হবার নায্য সুযোগ-সুবিধাটুকু। ফলে সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেয়ে-শিশুরা পেরে ওঠে না। এতে ছেলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আর মেয়ের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জন্মে। আর এ বোধ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা রাখে। এভাবেই পিতৃতন্ত্র সমাজব্যবস্থা বৈষম্য সৃষ্টি করছে। উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং মানবসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার। আর এর মাধ্যমেই ব্যবহৃত হবে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। অথচ মেয়ে-শিশুরা শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে পিছিয়ে আছে, শারীরিক-মানসিক পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। অধিকন্তু এরা ধর্ষণ, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার। এ সবের প্রভাবে মেয়েদের কর্মদক্ষতা ব্যাহত হয় যার প্রভাব পড়ে প্রথমে পরিবারে, এরপর সমাজে, সর্বোপরি রাষ্ট্রে। ফলে পরিবার-সমাজ-দেশ কর্মক্ষম মানবসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়, যা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই মেয়ে-শিশুর প্রতি বৈষম্য, জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতিকে চরমভাবে ব্যাহত করে।

বর্তমান গবেষণায় মেয়ে শিশুদের প্রতি বৈষম্যের নানান ব্যাপ্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেয়ে-শিশুর প্রতি বৈষম্যের প্রধান ক্ষেত্র হল পরিবার আর পিতা-মাতাই হল অন্যতম বৈষম্য সৃষ্টিকারী। এক্ষেত্রে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। আর এ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিক্ষা ও পরিবারের স্বচ্ছলতা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা

যায় পিতা-মাতারা ইচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্য না করলেও সমাজ ব্যবস্থার কারণে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয়। মেয়ে-শিশুদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিতে আরেকটি উপাদান সক্রিয় তা হল পুত্র-সন্তানের তীব্র প্রত্যাশা। সমতাভিত্তিক সামাজিক উন্নয়নের জন্য এর প্রতিকার প্রয়োজন। এ বৈষম্য শুধু মেয়ে-শিশুটির ব্যক্তি জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্থ করছে না, ক্ষতিগ্রস্থ করছে পরিবার ও সমাজকে, বিঘ্নিত করছে মানব-সম্পদ উন্নয়নকে, সামগ্রিকভাবে ব্যাহত করছে উন্নয়ন প্রয়াসকে।

তথ্যনির্দেশিকা

[১] হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৩১।

[২] হুমায়ুন আজাদ,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০।

[৩] ইউনিসেফ-জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকার, *জাতিসংঘঃ শিশু অধিকার সনদ*, (ঢাকা: ১৯৯১), পৃ. ১৩।

[৪] হুমায়ন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

[৫] খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য (সম্পা:), *নারী ও উন্নয়ন: প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান* (ঢাকা: উইমেন ফর ইউমেন, ১৯৯৫), পৃ. ১১১।

[৬] আনোয়ার হোসেন, *মেয়ে-শিশু সামাজিক বৈষম্য, ধরন ও প্রভাব*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৪৬।

[৭] হাসিনা আহমেদ, *বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, (ঢাকা: ১৯৮৯), পৃ. ১৩।

[৮] আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

[৯] আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।

[১০] খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য (সম্পা:), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

[১১] ড. মো: মাইমুল আহসান খান, *ধর্ষণ ও আমাদের করণীয়*, (ঢাকা: চিন্তামুক্ত প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ২৫।

[১২] হাসান শরীফ আহমেদ (সম্পা:), *নির্যাস* খন্ড-৩ (ঢাকা: গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক, ১৯৯৭), পৃ. ৪৫।

[১৩] ড. মো: মাইমুল আহসান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

[১৪] ড. মো: মাইমুল আহসান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ .৪৭।

[১৫] হাসিনা আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

[১৬] নোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

[১৭] আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

[১৮] আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।